দাস-সংস্কৃতি

নির্মল ঘোষ

আমাদের বাড়ির আত্মীয় পরিজন সবারই খুব অল্প বয়স থেকে নাচ, গান আর নাটক বা যে কোনও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যেন নিত্য-কর্মের মতো ব্যাপার ছিল। তাই ছোটবেলা থেকে বড়দা (নিমাই ঘোষ—"ছিন্নমূল" খ্যাত) মেজদা (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ), চারুদা (চারুপ্রকাশ ঘোষ) ও দাদার (অমলেন্দু ঘোষ) প্রভাবে যেমন একাধারে সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজি, শরৎ বোস, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার (তখন কমিউনিস্ট), নৌসের আলির বক্তৃতা শুনেছি, আবার তেমনই সামনে বসে শুনেছি আবদুল করিম, রোশনারা বেগম, কেশরী বাইয়ের গান। আর জ্ঞান গোঁসাইয়ের রেওয়াজ মেজদার সঙ্গে শুনেছি সারপেন্টাইন লেনের বাড়িতে, বাণীর (বাণী কোনার) সঙ্গে উঠোনে জল-কুমীর খেলতে-খেলতে।

আজ যাঁরা কিংবদন্তী তাঁদের অনেকেই আমাদের জীবনচর্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে মিশে ছিলেন। আট মিলিমিটারের ছবির প্রোজেকশন বাড়িতে বসে দেখেছি। বড়দাকে নানা রকম ছবির, ফোটোগ্রাফি ও পেইন্টিং-এর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে দেখেছি। আবার তখনকার জাতীয়তাবাদী, সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছি। ঘরের মানুষ হয়েছেন ট্রটস্কি, লেনিন, স্তালিন, বুখারিন, প্লেখানভরা। দর্শনের ছিটেফোঁটাও আসতে আরম্ভ করেছে আড়ম্বরহীন মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। নাটকের থেকেও বাড়িতে সিনেমার প্রভাবটা ছিল বেশি। কারণ, 'পিকচার গোয়ার' ও 'পিকচার পোস্ট' কাগজের নিয়মিত পাঠক ছিল বড়দা।

দাদাদের প্রভাবে চিন্তাধারাটা দানা বাঁধে। আজ আমি অনেকটাই সরে এসেছি ওসব থেকে। বড়দা আর চারুদার একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে শিশিরকুমারের নাট্যচিন্তা বা নাট্যধারাটা খুবই বাস্তবতাবিরোধী। অভিনয় রীতিও ভীষণ পুরাতন পন্থার অনুসারী। এটা বোধহয় ওদের বোঝার ভুল ছিল। ১৯৪৩ সালে চারুদা এবং বড়দা গণনাট্যের ভিতর ওদের নাট্যচিন্তার মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ থেকেই গণনাট্য জন্ম নিয়েছে।

এর পরবর্তী অধ্যায় সবারই জানা। "জবানবন্দী" ছোট নাটক বিজন ভট্টাচার্যের, দেখতে গিয়েছিলাম বড়দার সঙ্গে। সেদিন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এসেছিলেন মনে আছে, পূর্ণ থিয়েটারে নাটকটি হয়েছিল। নাটকের শুরুতে শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেছিলেন "মধুবংশীর গলি"—আর গান হয়েছিল বটুকদার "নবজীবনের গান"। সেদিন আমার নাট্যচিন্তার আকাশ রাঙিয়ে দিয়েছিল এই অনুষ্ঠান। আমি তখন বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছেলে যে ট্রটস্কিপন্থী রাজনীতি করে। বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলাম।

স্কটিশ কলেজে পড়তাম। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদে আমি ছিলাম ছাত্র-জেহাদি। কিন্তু কলেজে গান নাটক করতাম আর ফুটবলটা খেলতাম।

কোনও এক রাজনৈতিক কারণে আমি পার্টি ছেড়ে দিয়ে ছাত্রফেডারেশনে এলাম আমার দুই বন্ধু ডাঃ দেবকুমার বসু আর সুকুমার বসুর প্রভাবে। এই সময় "নবান্ন" হচ্ছে টানা কয়েকদিন ধরে শ্রীরঙ্গমে (বর্তমান 'বিশ্বরূপা')। সেখানে ছাত্র ভলান্টিয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মঞ্চের ভিতর থেকে ডাক এল। বড়দা আর চারুদা ডাকছে। গিয়ে শুনি একটি ছোট চরিত্রের এক অভিনেতা অসুস্থ, আমাকে নামতে হবে। যাইহোক অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও দুদিন অভিনয় করেছিলাম। সেদিন ধারণাই করতে পারিনি যে এমন একটা যুগান্তকারী নাটকের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে পড়বে। আজ এজন্য সত্যিই গর্ব বোধ করি।

গণনাট্যের "নবান্ন"-র পরের নাটক শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় "মুক্তধারা"। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির লিটারেচার-সেলের কর্মী। চারুদার ডাকে "মুক্তধারা"য় অভিনয় করলাম। রাজপুত্র সঞ্জয়ের ভূমিকায়। এরপরই আমার সমস্ত আকর্ষণ গিয়ে পড়ল ওই গণনাট্যের দিকে। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। একদিকে শিল্পীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই অন্যদিকে সংগঠকদের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। সবই আসছে নানা ধরনের আদর্শবাদের মোড়কে। কম বয়স, অল্প অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমার উৎসাহের শেষ ছিল না। যদিও চোখের সামনে নাট্য-প্রচেষ্টা সবই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সেইসময় বোম্বাই গণনাট্যের "স্পিরিট অব ইন্ডিয়া" কলকাতায় এসে সারা শহর মাতিয়ে গেছে। "স্পিরিট অব ইন্ডিয়া"তে রবিশঙ্কর, প্রীতি ব্যানার্জি, আপুনি, শচীনশঙ্কর, প্রেম ধাওয়ান তাদের যৌবনের শিল্প সাধনার সমস্ত ক্ষমতাটা একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এঁরা সবাই একসঙ্গে থাকতেন বোম্বাইয়ের কমিউনে। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল। আজকের এই দিশেহারা সমাজে এ আর সম্ভব নয়। শুধু বসা, শুধুই আলোচনা, শুধু গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের একটা ক্লান্তিকর পরিবেশ। এরই মধ্যে বিজনদার "জীয়নকন্যা"-র রিহার্সাল হয়, আবার থেমেও যায়। অনাদিপ্রসাদ, ঘনশ্যাম, পিনাকি—এঁরা তিনজন এসেছেন কলকাতায়। উদয়শঙ্করের আলমোড়া সেন্টার ভেঙে গেছে। গণনাট্যে একটা সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রে ওঁরা এসে পড়লেন। পিনাকিদা একটা নৃত্যনাট্য করেছিলেন—যার ফাঁকে-ফাঁকে ছিল ছোট-ছোট নাটিকার দৃশ্য। এতে তখন যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা আজ সংস্কৃতি জগতে খুবই পরিচিত নাম। কিন্তু তখন এঁরা সবাই শিক্ষানবীশমাত্র। যেমন শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরি (বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়) কলিম শরাফি (বর্তমানে বাংলাদেশের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এক প্রবাদপুরুষ)। কলিমদা তখন অভিনয়ের দলে ছিলেন। কলিমদা,

দেবব্রত বিশ্বাস আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে গানের তালিম নিচ্ছেন আর গণনাট্যের কোরাসেও অংশগ্রহণ করছেন।

দেশের অবস্থা তখন চরম সংকটের দিকে যাচ্ছে। প্রাক-স্বাধীনতার বছরগুলো, সবে দুর্ভিক্ষ থেকে মরে-ঝরে দেশটা উঠে আসছে। কিন্তু অপরদিকে দেশভাগের প্রস্তুতি চলছে। কমিউনিস্ট পার্টির তখন প্রধান স্লোগান হচ্ছে : 'গান্ধী জিন্না ফির মিলেঙ্গে' কারণ, তখন অনেকগুলো বৈঠকই (এঁদের মধ্যে) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এদিকে, কলকাতার উপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঝড়ও বয়ে যাচ্ছে টানা। ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র শ্রমিকদের মোকাবিলা। রশিদ আলি, রামেশ্বরের শহিদ হওয়া, হিন্দু-মুসলমানের দেশভাগের উত্তেজনা মাঝে-মাঝে স্তিমিত হয়ে একটা মিলনের বাতাবরণও তৈরি করছে।

স্বভাবতই এই রাজনৈতিক নাগরদোলার দোলানি এসে লাগছে আমাদের সংস্কৃতি-কর্মী, নাট্যকর্মীদের উপর। শুধু আঁচ লাগার প্রশ্নই নয়—আমরা তো কমিউনিস্ট সংস্কৃতি-কর্মী। মূলের প্রতিচ্ছবির যে সুপারস্ট্রাকচার তার তো আমরাই প্রধান অঙ্গ। তাই রাজনৈতিক সমস্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৈরি হল "শহিদের ডাক"। এই শহিদের ডাক তৈরির যে ফর্মটা—সেটা ছিল ভারতে একেবারে একটি নতুন ফর্ম। যদিও এই ফর্মটির উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন উদয়শঙ্কর। কিন্তু আমরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাসকে শ্যাডো-প্লে এবং ব্যালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলাম। শহর গ্রামের লক্ষ-লক্ষ দর্শক দিনের পর দিন তা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য, তাঁর সঙ্গে সহায়ক ছিলেন সুধী প্রধান। আর এটাকে পরিচালনা করার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বে ছিলেন তখনকার সর্বভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সহ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন। নিরঞ্জনদার সঙ্গে সর্বক্ষণের সহযোগী ছিলেন অতুল চৌধুরি, কল্যাণী সেন এবং আমিও। এই শ্যাডো-প্লে-র প্রধান অনেকগুলি সিকোয়েন্সের নায়ক ছিলাম আমি। কখনও রামেশ্বর, কখনও রশিদ আলি, কখনও তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা, আবার কখনও রায়ত বিদ্রোহী। মিউজিক, নানারকম আবহ ইত্যাদিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে অন্যান্য মাধ্যমেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন বংশীচন্দ্র গুপ্ত সবে গুজরাত থেকে এসেছেন। বংশীদা আমাদের সঙ্গে ঢোল বাজাতেন। বংশীদা ছিলেন জ্ঞান মজুমদারের সহকারী। এছাড়া ব্যালের ব্যাপারে যেমন অনাদিদা, পিনাকিদা আর ঘনশ্যামদা ছিলেন তেমনই কোরিওগ্রাফার ছিলেন বুলবুলে চৌধুরি। বুলবুলদার নামেই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হয় 'বুলবুলে অকাদেমি'। সেই বুলবুলে ডান্স ড্রামা অকাদেমি এখন বাংলাদেশের গর্ব। বুলবুলদার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। এখনও মনে পড়ে এয়ারলাইনসের অফিসার ব্রিটিশ আমলে চাকরি যাওয়ার ভয় উপেক্ষা করে বিকেলে গলদঘর্ম হয়ে এসে আমাদের নাচ শেখাচ্ছেন। চোস্ত স্যুটপরা উচ্চশিক্ষিত মানুষটি টাই খুলে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন। বুলবুলদা আর নারাণদা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) ছিলেন সহপাঠী বন্ধু।

দেশ জ্বলছে সাম্প্রদায়িক বিষে, সেইসময় এই দুই বন্ধুর কী মধুর, কী স্পর্শাতুর সম্পর্ক চোখের সামনে দেখেছি। উত্তর কলকাতার কমল বসুর বাড়িতে মহড়া দিয়ে বেরোনোর সময় নারাণদা বারবার বলছেন 'বুলবুল তোকে কেউ বুঝতে পারবে না তো—সাবধানে যাস' ইত্যাদি। বুলবুলদা মুসলমান ছিলেন। কী যন্ত্রণা নিয়ে বুলবুলদা পাকিস্তানকে নিজের দেশ হিসাবে পরবর্তীকালে বেছে নিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু এরপরেও সারা পূর্ণিয়া নাচের দল নিয়ে যখন ঘুরেছেন সেখানে সবসময় সঙ্গে নিয়েছেন তাঁর প্রথম জীবনের গণনাট্যের হিন্দু ছাত্রদের। এরকমই এক ছাত্র শম্ভু ভট্টাচার্য।

"শহিদের ডাক" শ্যাডো-প্লে আর ব্যালে ট্রুপের সাফল্য যখন প্রায় ভেঙে যাওয়া গণনাট্যকে আবার তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে, সালটা ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে, ঠিক সেইসময়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সর্বক্ষণের অফিস সম্পাদকের কাজ করতে। নিছক কেরানির কাজ। সেই কাজের মধ্যে থেকেও গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে এই দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সময় বর্তমানের বিপ্লবী বাগাড়ম্বরকারী নাটুকে নেতাদের বা নবনাট্যের কোনও সৈনিকের দেখা পেয়েছিলাম কিনা আমার মনে পড়ে না। এখন নবনাট্যের যাঁরা নেতা সত্যিকথা বলতে কি, তাঁদের নাটক কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয়নি। তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করে সরকারি সাহায্যের উপর। সে কি এখানে, কি দিল্লিতে। তখনকার গণনাট্য যে বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল তাঁরা ক্ষমতার চৌহদ্দিতে ছিলেন না। বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতার আনুকূল্য আছে। আর সেই আনুকূল্যের জন্য জনতার আনুকূল্য হারাতে হয়েছে। সোমনাথ লাহিড়ি মন্ত্রী থাকার সময় শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভাতে বলেছিলেন 'আপনারা কথায়-কথায় সরকারি সাহায্য চান কেন? আমি আপনাদের সাহায্য করলে আমার একটা প্রতিদানের দাবি তো থাকবেই। তাতে আপনাদের স্বাধীন-মতপ্রকাশের অঙ্গীকার কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?' কথাটা যে কত বড় সত্য তা আজকের শিল্প সংস্কৃতির দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সেদিন কাগজে দেখছিলাম সলিল চৌধুরি এক সম্বর্ধনা সভায় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হন। প্রশ্নটি হচ্ছে: 'আপনি সেকালের মতো গণসঙ্গীত আর লিখছেন না কেন?' তার উত্তরে সলিলদা বলেন, 'আমাকে সেই কালটা ফিরিয়ে দিন আমি গণসঙ্গীতে-সঙ্গীতে ভরিয়ে দেব। এখানে পলায়নপর মনোবৃত্তির একটা আভাস থাকলেও কথাটা অনেকাংশে সত্যিও বটে।

সলিলদার লেখা নাটক "সংকেত" ১৯৪৯ সালে আক্রান্ত হয়েছে। শহরের গণ-আন্দোলনের উপর লেখা। পরবর্তীকালে বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার, যিনি শেষজীবনে গণনাট্যের প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সভাপতিও ছিলেন, শচীন সেনগুপ্তকে বলতে শুনেছি—এমন সর্বগুণসম্পন্ন নাটক আমি খুব কমই দেখেছি। সেও তো ছিল সংগ্রামের নাটক; কিন্তু স্লোগানধর্মী নাটক তা ছিল না।

৪৮-৪৯ সালে বি টি রণদিভের নেতৃত্ব এল কমিউনিস্ট পার্টিতে, পি সি যোশির পরিবর্তন হল বহু বছরের পর। সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের পরিবর্তে এল সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের ডাক। সঙ্গে-সঙ্গে গণনাট্যের সাংস্কৃতিক মতাদর্শেরও পরিবর্তন হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির যে লাইনের সঙ্ঘাত ছিল তারই অনুকরণে এখানেও এল পরিবর্তন। লুই আরাগ'র লাইন ছিল, রাইটার ফাইটার। সংগ্রামে যে লেখক বন্দুক না ধরছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কলম ধরারও অধিকার নেই। ক্যাসানোভার লাইন ছিল, লেখককে যুদ্ধক্ষেত্রে যে নামতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকতেই পারে না। লেখক-শিল্পীদের একটা বিশেষ অনুভূতি থাকে যার দ্বারা তাঁরা জীবন-সংগ্রামের মূলে সত্যকে ধরতে পারেন।

কিন্তু ৪৮-৪৯ সালে ঝানভের থিসিসও এল ; সেও এক অতিবিপ্লবী চেতনার প্রতিভূ। মজার ব্যাপার হল ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দিকপালরা এই চিন্তার দ্বারাই পরিচালিত হলেন। আমাদের এখানে দেখলাম ননী ভৌমিক, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, রেবা হোড় প্রমুখ লেখক-শিল্পীরা বড়কমলাপুরের কৃষক বিদ্রোহে গিয়ে অংশগ্রহণ করলেন—ওখানকার সম্মেলনে যোগদান করেন। আমিও এই দলে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখলাম কালী ব্যানার্জি, সাধনা রায়চৌধুরিরাও এসেছেন গণনাট্যের তরফ থেকে। এই ঘটনাগুলো সাধারণ ঘটনা কিন্তু এগুলোর মূল্যায়ন করতে গেলে বর্তমান বিপ্লবী সাংস্কৃতিক নেতারা যাঁরা কথায়-কথায় হাজার-হাজার টাকা খরচ করে প্রায়শই সাংস্কৃতিক সংহতি আর নানা ছুতোনাতায় বোম্বাইয়ের মিঠুন কিংবা এই শহরের একসেট চেনামুখের সমাবেশ করছেন, আর একই কথা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো বক্তৃতায় বিপ্লবের দায়িত্ব সমাধা করছেন তাঁদের সঙ্গে পূর্ববর্তিদের তুলনা করলে বর্তমানের চেহারাটা বোঝা যাবে। এই ধরনের কার্যকলাপ করে যেতে-যেতে তাঁরা দ্রুত খাদে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন।

জাতীয় সংহতিই বলুন, আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই বলুন এসব যে কিছু সরকারি সাহায্যের সুবিধাভোগী এলিটের সান্ধ্যবিলাস, এটা বুঝতে আর কারও বাকি নেই। এঁরা কিন্তু রাজহরার শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখর হতে সঙ্কোচ বোধ করেন। কারণ, প্রথম কথা শাসকদলেরা কেউ শঙ্কর গুহ নিয়োগিকে তাদের ব্যান্ড-ওয়াগনের সদস্য করতে পারেনি। শঙ্কর গুহ নিয়োগি শ্রমিক আন্দোলনের যে বিকল্প মডেল খাড়া করেছিলেন, সেটা এঁদের পক্ষে হজম করা ছিল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যে শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মুখর হতে হবে তাঁদের আর্থিক আনুকূল্য তো এঁদের যে কোনও উৎসব সংগঠিত করতে গেলে প্রয়োজন হয়। শিল্পপতিদের আনুকূল্য সরকারি নেতাদেরও প্রয়োজন। টাকার লেনদেনের এইসব ছক বিপ্লবী সাংস্কৃতিক নেতাদের একেবারে নখদর্পণে।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, একবার ওয়েলিংটনে গণনাট্য প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল সাতদিন ধরে। আমি তখন গণনাট্যের সম্পাদক। সারারাত্রি যাত্রা আর ক্ল্যাসিকালের

প্রোগ্রাম ছিল। তখনকার দিনের সংগীতপ্রেমিক এক মাড়োয়ারি ব্যবসাদার এসেছিলেন তা শুনতে, অনুষ্ঠানের মাঝে তিনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে তিনি একহাজার টাকার একটা চেক আমাদের দিচ্ছেন। সাহায্য হিসাবে। চেক পেয়ে আমরা খুবই ম্রিয়মাণ। সম্মেলন চুকে যাবার পর আমরা দেখলাম চেকটি অ্যাকাউন্ট-পেয়ি। আমাদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। কিন্তু তিনমাস ধরে সেই চেক ভাঙানোর কোনও পন্থা আমরা বের করতে পারিনি। চেকটা নষ্ট হয়ে গেল। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। টাকার লেনদেন করতে আমরা তখন শিখিনি। সম্ভবত আমাদের শক্তির উৎসও বোধহয় সেটাই ছিল। এখন নাট্য আন্দোলনই বলুন আর সাহিত্য আন্দোলনই বলুন সবই সীমাবদ্ধ—কমিটিতে ঢোকা, সুবিধা আদায় করা, কিছু টাকা, কিছু খামচে নেওয়া ইত্যাদির মধ্যে। সমস্ত মুক্তির পথের লক্ষ্য ওই রাইটার্স বিল্ডিং, দিল্লি, মান্ডি-হাউস। সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে পথ দেখানো এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো আসছে পরে। এইসব করতে-করতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা সুবিধাভোগী ধান্দাবাজশ্রেণীর জন্ম হচ্ছে, আর তা হচ্ছে সরকারি আনুকূল্যে। তথাকথিত শিল্পীরা তাঁদের যৎসামান্য সৃজন ক্ষমতাও হারাচ্ছেন। কিন্তু প্রচারের ঢক্কানিনাদের পিছনে বাঘারি লাগিয়ে খড়ের কয়েকটা পুতুলকে সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন ক্ষমতার মধ্যমণিরা। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এরাও মারা পড়বে—যেমন পড়েছে রুমানিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়াতে।

ডাঃ বিধান রায়ের আমলেও শিল্পী সাহিত্যিকদের একটা মধুচক্র ছিল। তখন সেখানে সেসময়ের দারুণ প্রভাবশালী এক অভিনেত্রীকে দেখা যেত। রাইটার্সে দিবারাত্র এঘর-ওঘর করছেন তিনি। আবার একালেও তখনকার দিনের এক আন্ডারডগ অভিনেত্রীকে দেখা যায় ঘোরাফেরা করতে। ক্ষমতার বৃত্তের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে সমৃদ্ধি এসেছে কিন্তু শিল্পী হিসাবে ভোঁতা হয়ে গেছেন।

এটা তো গেল আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের আত্মসমর্পণের ধান্দার কথা। ৪৪ সালে আনন্দভবন থেকে গণনাট্যসঙ্ঘের একজন সম্পাদিকা শ্রীমতী পার্বতী কুমারমঙ্গলমকে একটি চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন, নাট্য আন্দোলনের কোনও মূল্যই নেই চীন বা স্পেনের যুদ্ধের পার্টিজানদের প্রচারধর্মী নাটক যদি তাতে না থাকে। নাটকটা কতটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হচ্ছে তার উপরেই নেহরুর গণনাট্যের প্রতি বন্ধনটা নির্ভর করছে। সেসময় গণনাট্যের সভাপতি যথারীতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, এন এম যোশিরা ছিলেন। ভাবুন ক্ষমতায় আসার পর এই নেহরুই গণনাট্যের উপর আক্রমণ শুরু করলেন। তেলেঙ্গানাতে নাটক চলাকালীন গুলি চলল, শিল্পীরা মারা গেলেন। ক্ষমতা বা শাসনের নামই দমন, পীড়ন এবং তণ্ডকতা।

এখন পশ্চিমবঙ্গেই বা কী হচ্ছে। এখানকার সরকার নাকি 'বীভৎস' সংস্কৃতিপ্রেমী। নাটকের কমিটি হচ্ছে। সিনেমার কমিটি হচ্ছে। সরকার অনুদান দিচ্ছেন। সাহায্য করছেন। এসব কথাগুলো দারুণ ভাল কথা। কিন্তু কমিটিতে

কারা আছেন। তাঁদের বিশেষ-বিশেষ শিল্পকর্মের উপর কতটা দখল আছে? তাঁরা সরকারকে নিশ্চয়ই নাটক, ফিল্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারবেন। সরকারের ভাণ্ডার খালি করে যাতে কিছু অপগণ্ড পোষা না হয় তা তাঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন। এসবই এই সরকারের কাছে সবাই আশা করতে পারত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটল ঠিক এর উল্টোটা। সরকারের ভাণ্ডার শূন্য করে ছবির পর ছবি তৈরি করানো হয়েছে সরকারের এবং দলের সমর্থকদের দিয়ে। যাঁরা সমর্থনের ভান করেছেন তাঁরাও ছবির ঠিকা পেয়েছেন। সেই সব ছবি গুদামজাত হয়ে পড়ে রয়েছে। কোটি-কোটি সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থে ভাগ বসিয়ে কিছু জাল বিপ্লবী ছবির কারিগরকে দিয়ে ছবি বানানো হয়েছে—আর তারা সেই ছবিগুলো করতে গিয়ে টাকা নয়-ছয় করেছে বলেও শোনা যায়। এখন কোনও সময় যদি জনসাধারণ সরকারকে চেপে ধরে বলে, এই ধান্দায় এই টাকাতে সরকারি কর্তাদেরও ভাগ ছিল —তাহলে? পূর্ব ইয়োরোপ বা সোবিয়েতে ঠিক এইরকম নানাধরনের প্রশ্নও উঠেছিল। প্রসঙ্গত, গোরবাচভের আমলে যখন পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের রমরমা যুগ চলেছে তখন সেখানকার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী কলকাতায় এসেছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সবে মন্ত্রী হয়েছেন। তেরো বছর বয়স থেকে বলশয় থিয়েটারের শিল্পী হিসাবে কাজ করেছিলেন। শেষকালটা সোবিয়েতের নাটক অকাদেমির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। গোরবাচভ এসে কাজ জানা অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে ভদ্রলোককে সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী করেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক একান্তে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি ওখানকার সমস্যার কথা বললেন। বললেন, পার্টির চারপাশের লোকেরা পার্টির নেতৃত্বকে বোঝাতেন সমস্ত নাট্য প্রচেষ্টাকেই সরকারি অনুদান দেওয়া উচিত। তাঁরা সরকারকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে গেছেন। আলমা আতায় শ্রমিকদের পরিচালিত থিয়েটারে পাস দিলেও লোক আসে না। তাই এখন সমস্ত অনুদান দেওয়া বন্ধ। পেশাদার থিয়েটারকেও বলা হয়েছে, টিকিট বিক্রি করে যদি থিয়েটার না চলে তো সেই থিয়েটার ভর্তুকি দিয়ে চালানো যাবে না। এখানে এখনও সরকারের দাসানুদাস শিল্পীদের নানানখাতে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গাঁটছড়া বাঁধতে অনিচ্ছুক সেইসব শিল্পীকে নানান কায়দায় একঘরে করার চেষ্টাও একই সঙ্গে চলছে। তাও এখানকার সরকার এমন একটা মিশ্র ব্যবস্থার ভিতর আছেন যেখানে যা-ইচ্ছা করার পুরো স্বাধীনতা নেই। সেটা পেলে না জানি আরও কত কী হতো!

সংস্কৃতি জগতের এইরকম দাসসুলভ কার্যকলাপ কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এখন তো ঢালাও পুরস্কার, খেতাব, সরকারি-সম্মান বিতরণের যুগ। যে শিল্পী একবার এই ফাঁদে পা দেন, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বরও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি এমন একজন সংস্কৃতিসেবী যে ব্রিটিশ আমলের নাট্য আন্দোলনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গেছি—আবার উত্তর স্বাধীনতাপর্বে দাস-সংস্কৃতি যুগের গর্ভগৃহের অবস্থাও দেখেছি। হাড়ে-হাড়ে সেই যন্ত্রণাও ভোগ করেছি। □